লতিফ কাকু চলে গেলেন

নুরুল্লাহ্ মাসুম

ওরা আমার মুখের ভাষা
কাইড়া নিতে চায়
ওরা কথায় কথায় শিকল পড়ায়
আমার হাত ও পায় ॥

কইত যাহা আমার বাবায়
কইত যাহা আমার দাদায়
এখন কও দেখি ভাই কেমনে আমার মুখে
অন্য কথা শোভা পায়?

সইমু না আর সইমু না--॥

১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনের ওপর লতিফ কাকুর লেখা ও সুর করা বিখ্যাত গানের প্রথম কয়েকটি চরণ। গানটি তিনি লিখে সুর দিয়ে গেয়েছিলেন ঢাকা কলেজের এক অনুষ্ঠানে ঢাকার ব্রিটানিয়া সিনেমা হলে। গানটি তাঁর কণ্ঠে যে না শুনেছে, বুঝবে না তাঁর গলায় কত দরদ ছিল সে গান গাওয়ায়।

১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তাঁর লেখা ও সুর দেয়া আরেকটি গান তিনি নিজেই গেয়েছিলেনঃ

দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা
কারো দানে পাওয়া নয়,
দাম দিয়েছি প্রান লক্ষ-কোটি
জানা আছে জগতময়।
১৭৫৭ সালে
ওরে ভাইবা দেখেন পড়বে মনে
আরো দাম দিয়েছি পলাশীর মাঠে
ইতিহাস তার স্বাক্ষী রয়॥

এছাড়াও মহান ভাষা আন্দোলনের ওপর রচিত আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী রচিত একটি কবিতায় তিনি প্রথম সুরারোপ করেন এবং সকণ্ঠে গেয়েছিলেন। পরবর্তীতে আরেক মহান সূর-সাধক

আলতাফ মাহমুদ-এর দেয়া সুরে গানটি কালজয়ী রূপ ধারণ করে আজো বেঁচে আছে প্রতিটি বাঙালীর হৃদয়ে। যতদিন বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশ থাকবে ততদিনে গানটি বেঁচে থাকবে। সুপ্রিয় পাঠক এতক্ষণে বুঝে গেছেন গানটি হল

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী,
আমি কী ভুলিতে পারি?"

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যে গানটি নিয়মিত প্রচারিত হত,

"সোনা সোনা লোকে বলে সোনা,
সোনা নয় তত খাটি,
বল যত খাটি তার চেয়ে খাটি বাংলা
দেশের মাটি, আমার জন্মভূমির মাটি",

-এটিও তাঁর রচিত এবং সুরারোপিত। গেয়েছিলেন তিনি নিজেই।

লকিফ কাকুর গাওয়া আরো কয়েকটি গানের মধ্যে ছিলঃ

বাংলার হিন্দু,
বাংলান খৃষ্টান,
বাংলার বৌদ্ধ,
বাংলার মুসলমান,
আমরা সবাই বাঙালী॥

মুজিব বাইয়া যাওরে
নিযাতিত দেশের মাঝি
জনগণের নাওরে
মুজিব, বাইয়া যাও রে॥
ছলে বলে চব্বিশ বছর
রক্ত খাইলো চুষি
জাতিরে বাচাইতে গিয়া
মুজিব হইল দোষী রে
মুজিব বাইয়া যাওরে. . .॥

তালিকা দীর্ঘ .. অনেক দীর্ঘ। একজন মহান শিল্পী, শিক্ষকের গাওয়া গানের তালিকা শেষ হবার মত নয়। তিনিতো ছিলেন একাধারে সংগীত শিক্ষক, গীতিকার, সুরকার এবং শিল্পী। জীবনের এমন কোন সময় আসেনি তাঁর জীবনে, যখন তিনি সংগীতে ক্ষ্যান্ত দিয়েছেন।

এবার বলি, প্রখ্যাত এই শিল্পী আমার রক্তের সম্পকের কোন মানুষ ছিলেন না। তাঁর সাথে আমার সরাসরি কথাও হয়েছে জীবনে একবার। তাঁকে কেন কাকু বলে সম্বোধন করছি? ফিরে যাই আমার ছেলে বেলায়।

১৯৬৬ বা ৬৭ সাল। আব্বা বাড়ীতে আনতেন বেতার বাংলা। ঢাকা টেলিভিশনের ছবি আমরা তখন দেখতে পাই না। শুনেছি টিভির কথা। রেডিওর মতন গান ও কথার সাথে সাথে মানুষের ছবিও দেখা যায়। কি অদ্ভুত তাই না? আজকের শিশুদেও কাছে আমার কথা বিশ্বাসযোগ্য হবার নয়। যা হোক, নিয়মিত রেডিও শোনাটা একেবারেই অভ্যাস ছিল। সে সময়ে যাদের নামের ও তাদের কণ্ঠের সাথে পরিচিত হই তাঁদের মধ্যে শিল্পী আব্দুল লতিফ, আব্দুল আলীম, ফেরদৌসি বেগম/রহমান, রথীন্দ্রনাথ রায়, অভিনেত্রী আয়েশা আক্তার, সংবাদ পাঠক ইমরুল চৌধুরী, সিরাজুল মজিদ মামুন প্রমুখের কথা আজ মনে করতে পারছি। আরো পরে যাঁর গান আমাকে খুব টেনেছিল, তিনি হলেন সরদার আলা উদ্দিন।

মাঝেমধ্যে বেতার বাংলায় শিল্পীদের ছবিও ছাপা হত। (আজ বুঝতে পারি) জিঙ্কের ব্লকে ছাপানো ছবি কোনটাই পরিস্কার কেন হত না। তবু নতুন সংখ্যা ঘরে এলে ভাই-বোনদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে যেত। যদি কারো কোন নতুন ছবি থাকে সেখানে। এমনি দিনগুলোতে আমার পরিচয় আব্দুল লতিফের সাথে, বেতার বাংলার মাধ্যমে। প্রসঙ্গত উল্ল্যেখ করতেই হয়, আমার বাবার নামও ছিল আব্দুল লতিফ। আব্বার কাছেই শুনেছি শিল্পী আব্দুল লতিফ বরিশালের মানুষ। ওটা জানার পর আরো ভাল লেগেছিল। তখন পর্যন্ত প্রদেশে জেলার সংখ্যা ১৭টি, পরে ময়মনসিংহ থেকে টাঙ্গাইল এবং বরিশাল থেকে পটুয়াখালী জেলার সুষ্টি হয়ে মোট জেলার সংখ্যা হয়েছিল ১৯টি। আমার প্রিয় শিল্পী আমার জেলার লোক জেনে মনে মনে পুলকিত হতাম। আমার আব্বার নামে এই প্রিয় শিল্পীর নাম হওয়ায় তাকে মনে মনে কাকু বলেই ডাকতাম। বলে নেয়া ভাল বরিশালের আমাদের এলাকাতে বাবার বড় ভাইকে চাচা এবং বাবার ছোট ভাইকে কাকু বলে সম্বোধন করার রেওয়াজ বহুদিন ধরে। শিল্পী আব্দুল লতিফ আমার আব্বার চেয়ে ৭ বা ১০ বছরের ছোট ছিলেন। আমার আব্বার জন্ম ১৯২০ সালে আর শিল্পীর জন্ম ১৯২৭ সালে, অন্যস্থানে দেখেছি ১৯৩০ সালে।

১৯৫২ সাল। ভাষা আন্দোলনে বাঙালীর রক্তঝড়া বছর। ৫২'র পথ বেয়ে আমাদের স্বাধীনতার আন্দেআলন জোরদার হয় এবং আমরা স্বাধীনতা লাভ করি। স্মরণীয় ৫২'র ২১ ফেব্রুয়ারীকে মানুষের মনের গভীরে স্থান করে দিতে একটি গান যে অবদান রেখেছে, সেটির মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী রচিত "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী, আমি কি ভুলিতে পারি?" বিখ্যাত এ গানের রচয়িতার গ্রামের বাড়ী বরিশালের উলানিয়া গ্রামে। গানটির প্রথম সুরকার এবং গায়ক আব্দুল লতিফ, গ্রামের বাড়ী বরিশাল সদরের রায়পাশা গ্রামে। গানটি যে সুর নিয়ে আজো আমাদের প্রানের মাঝে চির জাগরূক হয়ে

আছে সে সুরটি দিয়েছিলেন আলতাফ মাহমুদ, গ্রামের বাড়ী বরিশালের মুলাদী। কি অদ্ভুত সমীকরণ! একটি গান, একটি জেলা, তিনজন গুণী মানুষ। আমরা গর্ব করতে পারি বৈকি। ১৯৭১ সালের ২৮ আগস্ট আলতাফ মাহমুদ শহীদ হয়েছেন পাক হানাদারদের হাতে। এই সেদিন চলে গেলেন আব্দুল লতিফ। কেবল বেঁচে আছেন আব্দুল গাফফার চৌধূরী। আমাদের প্রানের গানটির সাথে প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ত তিনজনের দু দুজন চলে গেলেন সম্পৃক্তার ক্রমানুসাওে, উল্টোভাবে। যিনি সবশেষে গানটির সাথে যুক্ত হয়েছিলেন এবং বিখ্যাত হয়েছিলো সেই সুর। তিনিই চলে গেছেন সবার আগে, আমাদের দুর্ভাগ্য স্বাধীন বাংলাদেশ তিনি দেখে যেতে পারেন নি। স্বাধীনতার ৩৪ বছর পরে চলে গেলেন গানটির সাথে সম্পৃক্ত দ্বিতীয় ব্যাক্তি, যিনি গানটির প্রথম সুরকার ও গায়ক। গানটির রচয়িতা কেবল বেঁচে আছেন, জানিনা তার মনের অবস্থা এখন কেমন... ৫২-৫৩-৫৮'র অগ্নিঝড়া দিনগুলোর স্মৃতি হাতরে তাঁর দিনগুলি এখন কেমন কাটছে। এইতো সেদিন আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী এক সাক্ষাতকারে বললেন, একটি গানদিয়ে অন্য কেউ না হলেও আমি বিখ্যাত হয়েছি। সেই গানের নৌকার মাঝি আজো বেঁচে আছেন, দু'জন দাড়ি চলে গেছেন, কেমন কাটছে সেই মাঝির দিনগুলি?

আব্দুল লতিফ ছিলেন ভিন্ন স্টাইলের কণ্ঠস্বরের অধিকারী, যেমনটি ছিলেন সূর সম্রাট আব্বাস উদ্দিন। তাঁর কণ্ঠের বিশেষত্বের কারনেও তিনি ছিলেন অনন্য। তার লেখা গানের মধ্যে প্রচুর বরিশালের আঞ্চলিক শব্দ গানকে আরো জনপ্রিয় করে তুলেছে। এমন ব্যাক্তিত্বে সাথে আমার প্রথম এবং শেষ সাক্ষাৎ হয় ১৯৮৯ সালের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে, তাঁর ইস্কাটনস্থ সরকারী বাড়ীতে। আমি শেখ তোফাজ্জল হোসেন এর সাথে সেখানে গিয়েছিলাম। এখানে তোফাজ্জল ভাইয়ের খানিকটা পরিচয় দেয়াটা অপ্রাসঙ্গিক মনে মনে করি না। শেখ তোফাজ্জল হোসেন তখন ইসলামী ফাউণ্ডেশনের উপ-পরিচালক, স্বাধীনতাপূর্বকালে ইসলামী একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতার ব্যাক্তিগত সচিব। এক সময়ের তুখোর কার্টুনিস্ট। সৈনিক পত্রিকায় কার্টুন এঁকে জেল খেটেছেন আয়ূব আমলে। বঙ্গবন্ধুর কাছাকাছি থেকেছেন জেলের ভেতর। আবার স্বাধীনতা পরবর্তীকালে একদলীয় শাসনের বিরুদ্ধে কার্টুন একে শাসকদলের লেকেদের হুমকীও সহ্য করেছেন। পাঠকের মধ্যে কেও যদি ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত কার্টুনিস্ট "ছারপোকা", "তোফা"-কে মনে করতে পারেন, তাঁদের অবগতির জন্য বলছি, সেই কার্টুনিস্টই হচ্ছেন শেখ তোফাজ্জল হোসেন। তিনি বাংলাদেশ বেতারের নিয়মিত সংবাদ ভাষ্যকারও বটেন। তাঁর আরেকটি পরিচয় আছে, তা হলো তিনি অনুশীলন নামে একটি ছড়া আবৃতি সংসদ পরিচালনা করতেন এক সময়ে। সেখান থেকে সৃষ্টি হয়েছে অনেক গুণী ছড়াকার। এদের মধ্যে অন্তত দু'জনের নাম আমি এখানে উল্লেখ করতে পারি যাদেরর স্বকণ্ঠে শুনেছি তোফাজ্জল ভাইয়ের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা। এদের একজন হলেন ছড়াকার লুৎফুর রহমান লিটন, বর্তমানে কানা প্রবাসী, অন্য জন ছড়াকার ওবায়দুল গণি চন্দন।

যাহোক, সেই তোফাজ্জল ভাইয়ের সাথে একদিন আব্দুল লতিফের বাসায় গেলাম। আগেই বলেছি সেটাই আমার তাঁকে প্রথম ও শেষ দর্শন। সেখানে আমি তাঁকে কাকু বলেই সম্বোধন করেছিলাম। যদিও তোফাজ্জল ভাই তাকে লতিফ ভাই বলেই সম্বোধন করতেন। কাকু সম্বোধন করার ব্যাখ্যা শুনে তিনি হেসে ছিলেন। গুণী মানুষের সান্নিধ্য কার না ভাল লাগে। ঘন্টাখানেক ছিলাম সেখানে। সাধ জেগেছিল তার কণ্ঠে একটা গান শুনবো, সাহস করে বলতে পারিনি সেদিন। সকল গুণী মানুষের মতই তিনি সেদিন আমার সাথে সাবলিল ব্যবহার করেছেন, কাকীর হাতে চা পান করেই ফিরেছিলাম সেদিন। সেদিনটার কথা মনে হলে আজো নিজেকে ভাগ্যবান মনে হয়। আলতাফ মাহমুদকে দেখার সৌভাগ্য হয় নি। আর একদম কাছে গিয়েও আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর সাথে দেখা করতে পারিনি। তবু ভাল লাগে মহান একুশের ত্রি-রত্নের এক রত্নের সাথেতো দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে।

প্রকৃতির নিয়মে মানুষ আসবে-চলে যাবে। সে নিয়মের বেড়াজালের বাইরে যাবার সাধ্য কারো নেই। কিন্তু আব্দুল লতিফের মত কওে ইতিহাসের পাতায় নাম লেখাবার সৌভাগ্য হয় ক'জনার? বাংলা, বাঙালী, বাংলাদেশ- এই তিনটি শব্দের সাথে যাদের নাম উচ্চারিত হবে, ক্ষীণ কণ্ঠে হলেও আব্দুল লতিফের নাম চিরদিন উচ্চারিত হবে।

মহান শিল্পী আব্দুল লতিফের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

নুরুল্লাহ্ মাসুম
দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত
২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০৫